প্রবন্ধ

এখন তা হলে কর্মসংস্থান যোজনাই ভরসা

মৈত্রীশ ঘটক

২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, ০০:০০:৩৩

দেশের আইন কারা তৈরি করেন, আমার তাতে কিচ্ছু এসে যায় না; আন্তর্জাতিক চুক্তির রচয়িতা কে, আমার তা নিয়েও মাথাব্যথা নেই— আমি শুধু তার জন্য অর্থনীতির পাঠ্য বইগুলো লিখে দিতে পারলেই হল।' কথাগুলো পল স্যামুয়েলসনের। ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজত্বে তিনি মত পাল্টাতেন কি না, কে জানে। তবে যে কাজগুলো কেউই করতে চান না, সেই তালিকায় বাজেট তৈরি করার কাজটি সব সময় থাকবে। এক দিকে গোটা দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর অন্য দিকে দেশের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা— দুটোকে এক জায়গায় আনতে পারা নেহাত সোজা কাজ নয়। ২০১৭ সালের ভারতে কাজটা আরও কঠিন। জেটলির পিছনে রয়েছে ডিমনিটাইজেশনের ধ্বংসস্তূপ, আর সামনে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন, যার ফলাফলে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের আভাস পাওয়া যাবে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে বাজেট তৈরি করা! কাজেই, অরুণ জেটলি বা দেশের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যনের সমালোচনা করার আগে মনে রাখা ভাল, তাঁদের কাজটা নেহাত সহজ ছিল না। এবং, সেই অনুপাতে তাঁরা খুব খারাপও করেননি।

জেটলি তাঁর ভাষণে ডিমনিটাইজেশনের পক্ষে খুব একচোট লড়ে গেলেন। বললেন, কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে এটা সাহসী পদক্ষেপ। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়বে, স্বচ্ছ হবে এবং সত্য হবে। তার আগের দিনই অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যন তাঁর তৃতীয় অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রকাশ করেছেন— চমৎকার একটি নথি। ভাবা যায়, একটা সরকারি নথি পড়তে রীতিমত ভাল লাগছে! এটাই তো যথেষ্ট কৃতিত্ব। আর্থিক নীতির মতো একটা সম্পূর্ণ নিরস প্রসঙ্গের আলোচনা

শুরু হয়েছে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ‘টাকা মাটি, মাটি টাকা’-র উদ্ধৃতি দিয়ে! তবে, ডিমনিটাইজেশনের দৌলতে দেশের অর্থনীতির অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আরও ভাল হত, যদি তিনি ‘ভয় কী রে পাগল, আমি তো আছি’ দিয়ে লেখাটা শুরু করতেন।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার হিসেব, ডিমনিটাইজেশনের ফলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ০.২৫ থেকে ০.৫ শতাংশ-বিন্দুর মধ্যে কমবে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের হিসেব, হারটি কমপক্ষে এক শতাংশ-বিন্দু কমবেই। তার চেয়েও বড় কথা, এই অনুমানগুলো সম্ভবত আসল ক্ষতির তুলনায় বেশ অনেকখানি কম। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে পাইকারি কেনাবেচার পরিমাণ অন্তত ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কমেছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ৬.৫ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির যে অনুমান রয়েছে, তাতে এই ছবিটা ধরা পড়েনি, কারণ সেই হিসেবে অসংগঠিত ক্ষেত্রের অঙ্কগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় না। ধরা হয়, অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবদান সংগঠিত ক্ষেত্রের অবদানের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে চলে। ডিমনিটাইজেশনের পর এই অনুপাতের অঙ্কটা ঘেঁটে গিয়েছে। দুই ক্ষেত্রের মধ্যে আর যোগ নেই।

অর্থনৈতিক সমীক্ষাতেও বলা হয়েছে, অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণেও বলেছেন যে মাঝারি মেয়াদে ভারতীয় অর্থনীতি ডিমনিটাইজেশনের ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে। কথাটা সত্যি, সন্দেহ নেই। ভারতের মতো বড় অর্থনীতি ধাক্কা সামলিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। দাঁড়ায়ও। কিন্তু, একটা কথা সম্পূর্ণ হারিয়ে যাচ্ছে— যে দেশে আর্থিক বৈষম্য বিপুল, সেখানে কোনও কারণে গরিব মানুষের আয় যদি অনেকখানিও কমে যায় কিন্তু ধনীদের আয়ে তেমন প্রভাব না পড়ে, জাতীয় আয়ের হিসেবে গরিবদের বিপর্যস্ত হওয়ার প্রতিফলন হবে অতি সামান্যই। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, ৯০ জন মানুষের আয় মাথাপিছু এক টাকা, আর ১০ জনের আয় মাথাপিছু ১০০ টাকা। তা হলে মোট আয় দাঁড়ায় ১,০৯০ টাকা। গরিবদের আয় যদি ২০ শতাংশ কমে যায়, কিন্তু ধনীদের আয় অপরিবর্তিত থাকে, তবে মোট আয়ের পরিমাণ কমবে মাত্র ১.৬ শতাংশ। কাজেই, অর্থমন্ত্রী বা অন্য কেউ যখন বলেন, ‘বৃদ্ধির হার মাত্র এক শতাংশ-বিন্দু কমবে’, অথবা ‘অর্থনীতি নিশ্চিত ভাবেই ঘুরে দাঁড়াবে’— ডিমনিটাইজেশনের ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ হারানো শ্রমিকের কাছে সেই কথার কোনও মানে হয় না।

অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? কর্মসংস্থানের সঙ্গে দেশের আর্থিক সুস্থিতির একটা ভারসাম্য বজায় রাখা; স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা; দেশের আর্থিক বৃদ্ধি এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদে যাতে দারিদ্র দূর করা সম্ভব হয়, তেমন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে বাহ্যিক পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো সামাজিক পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করা। বিভিন্ন সরকারের কাছে এই লক্ষ্যগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব পৃথক হতেই পারে। যেমন, যে সরকার কল্যাণ-অর্থনীতিতে বিশ্বাসী, তারা সামাজিক ক্ষেত্র ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য বেশি খরচ করবে। আবার যে সরকারের কাছে আর্থিক বৃদ্ধিই মূল কথা, তারা পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের দিকেই বেশি নজর দেবে। বাজেট ভাষণ থেকে মনে হচ্ছে, কৃষিক্ষেত্রকে কিছু সুবিধা দেওয়া ছাড়া এই বাজেটে এমন কিছু নেই, যাতে মনে হতে পারে যে ওপরে বলা তিনটি লক্ষ্যের একটির ক্ষেত্রেও সরকারের অবস্থানে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ বদল হয়েছে।

দুর্নীতি কমানো নিয়ে ঢের কথা হচ্ছে। কিন্তু এই বাজেট ভাষণেও জেটলি জানাতে পারলেন না, অসংগঠিত ক্ষেত্রকে তিনি কী ভাবে করের আওতায় নিয়ে আসবেন। কৃষি-আয়কে ছোঁয়ার সাহস হল না এখনও। আয়করের ক্ষেত্রে যে ছাড়টুকু দেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই তাকে স্বাগত জানাবেন। কিন্তু, এর ফলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তুলনায় করের অনুপাত যে ধাক্কা খেল, সেটা পুষিয়ে দেওয়ার মতো কোনও ব্যবস্থাও ঘোষিত হল না।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যদি সরকারের লক্ষ্য হয়, তবে তার জন্য বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হয়, পরিকাঠামোয় বড় মাপের বিনিয়োগ করতে হয়। প্রাথমিক হিসেব থেকে অন্তত কোনও

তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপের সন্ধান পাওয়া গেল না। আর্থিক বৃদ্ধিই যদি সরকারের কাছে পাখির চোখ হয়, তবে বাহ্যিক ও সামাজিক পরিকাঠামোয় নজর দেওয়ার কথা। স্বাস্থ্য বাদে আর কোনও খাতেই সেই নজরের কোনও প্রমাণ নেই। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বেড়েছে ২০ শতাংশ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র আট শতাংশ। স্কুল শিক্ষার ভাগ্যে সেটুকুও জোটেনি— ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ছয় শতাংশ। ছয় শতাংশ হারেই মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে ধরে নিলে এই ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ শূন্য।

সরকার যদি কল্যাণ-অর্থনীতিতে বিশ্বাসী হয়, তবে তার জন্য সামাজিক সুরক্ষা জালকে আরও শক্তপোক্ত করে তোলা প্রয়োজন, গ্রামীণ ক্ষেত্রে যাঁরা বিপন্ন, তাঁদের জন্য আরও বেশি সুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নিয়তির কী বিচিত্র পরিহাস! প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যে গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনা বিষয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, কংগ্রেসের ভ্রান্ত নীতির নির্দশন হিসেবেই আমি এই প্রকল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, সেই কর্মসংস্থান যোজনাই আজ তাঁর রক্ষাকবচ হয়েছে। ডিমনিটাইজেশনের পরে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ হারিয়ে যাঁরা গ্রামে ফিরে যাচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই এই প্রকল্পে কাজ পেয়ে অন্তত খেয়েপরে আছেন। খেয়াল করা ভাল, যে সময় বেশির ভাগ আর্থিক সূচকই সমানে কমে চলেছে, তখন কর্মসংস্থান যোজনা চলছে রমরম করে। কেন, অরুণ জেটলিও সম্ভবত জানেন।

অতএব, তাঁর বক্তৃতায় জানা গেল কর্মসংস্থান যোজনার ব্যয়বরাদ্দ ৩৮,৫০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে এক লাফে ৪৮,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। মূল্যবৃদ্ধির হার বাদ দিলেও এই বৃদ্ধি অনেকখানি মনে হচ্ছে, যদিও সংশয়, কতটা বরাদ্দবৃদ্ধি বাস্তবে হয়েছে, আর কতটা গত কয়েক মাসে বেড়ে যাওয়া খরচের প্রতিফলনমাত্র।

সে বৃদ্ধির হার আসলে যাই হোক, বৃদ্ধি হয়েছে। হয়তো প্রধানমন্ত্রী এ ভাবেই মেনে নিলেন, তাঁর ডিমনিটাইজেশনের প্রকল্পটি সার্বিক ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অথবা কারণ হয়তো উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন। অথবা, অচ্ছে দিন যেহেতু এখনও এল না, হয়তো কর্মসংস্থান যোজনাই একমাত্র ভরসা।

বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রীকে বার বার মহাত্মা গাঁধীর নাম নিতে হল। একেই বলে, ঠ্যালার নাম বাপুজি!

লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ অর্থনীতির অধ্যাপক